একক 3 ❑ শ্যামলী

গঠন

3.1 প্রস্তাবনা

3.2 পাঠ ও আলোচনা

3.2.1 শ্যামলী ঃ এই যে কালো মাটির বাসা

3.2.2 দ্বৈত

3.2.3 আমি

3.2.4 হঠাৎ দেখা

3.2.5 বাঁশিওয়ালা

3.2.6 চিরযাত্রী

3.2.7 অনুশীলনী

3.2.8 গ্রন্থপ্রঞ্জি

3.1 ঃ প্রস্তাবনা

'পুনশ্চ' পূর্বে শ্যামলীর আত্মপ্রকাশ। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে সময়কালে 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক', পত্রপুট ও 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। গদ্য কবিতার সার্থক প্রকাশ এই কাব্য চারটিতে দেখা গেল।

3.2 ঃ পাঠ ও আলোচনা

'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থে বিচিত্র স্বাদবাহী কবিতার দেখা মেলে। প্রেম মূলক দ্বৈত' ও বাঁশিওয়ালা গতিময়তার তত্ত্ববাহী 'চিরযাত্রী', আমিতাবোধক 'আমি' ও কাহিনীধর্মী 'হঠাৎ দেখা'।।

3.2.1 ঃ শ্যামলী ঃ এই যে কালো মাটির বাসা

১৩৪৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রকাব্য 'শ্যামলী'। সমকালীন এক কাব্যবৃত্তে এর অবস্থান। রবীন্দ্রসাহিত্য ধারায় গদ্য কবিতার সার্থক প্রকাশ কালে 'শ্যামলীর' আত্মপ্রকাশ। 'পুনশ্চ' কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে,

‘শেষসপ্তক’ ১৩৪২ বঙ্গাব্দে এবং শ্যামলীর সমকালে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশ পেয়েছিল পত্রপুট। গদ্য কবিতার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে এই কাব্যচতুরঙ্গে।

বাংলা কাব্যে গদ্যরীতি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি, লিপিকাতে তার সূচনা হয়েছিলো। পরে ‘বলাকা’ কাব্যের মুক্ত এক ছন্দে তার অস্ফুট আভাস মিশেছিল—পরবর্তী ‘পলাতকা’ ও ‘মহুয়া’য় প্রবহমান ছিল তাঁর প্রবাহ এবং ‘পুনশ্চ’তে এসে ঘটলো তার দ্বিধামুক্তি।

এই চারটি কাব্যে রীতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঋতু পরিবর্তনও ঘটেছে। বহিরঙ্গ কাঠামোর এসেছে গদ্য ছন্দের নির্মাণ কৌশল এবং অন্তরঙ্গ ভাবনায় যুক্ত হয়েছে নন্দিত সৃষ্টির শিল্পসুষমা।

‘পরিশেষে’ কাব্যগ্রন্থ লিখে কবি একটি অধ্যায় বা পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সময়ের চলমানতায় নতুন পাথের বাঁকে দাঁড়িয়ে কবি মুখ ফেরালেন— দেখলেন সামনে দাঁড়ানো নতুন কালকে। তখনই কাব্যে এেহল ‘পুনশ্চ সংযোজন। একাব্যের ‘নতুন কাল’ কবিতায় কবি নতুন সমাজের উপযোগী নতুন মনন কল্পনার কথা বললেন—

“আমার বাণীকে দিলেম সাজ পরিয়ে
তোমাদের বাণীর অলংকারে”

নতুনকালের বৃহত্তর জনসমাজের কাছে তাদেরই দুঃখের ভাষায়, কথ্যরীতিতে, নিরলংকার সহজ সরল ছন্দে সাজালেন কাব্যকে। ‘শ্যামলী’ কাব্যে তার পূর্ণতর প্রকাশ ঘটলো।

‘শ্যামলী’ কবির শেষ বেলাকার মাটির ঘরের নাম। মাটির বাসার কথা তাঁর কবিতায়, গানে বারবার ফিরে এসেছে।

“এই যে কালোমাটির বাসা
শ্যামল সুখে ভরা”

বাংলাদেশের শ্যামল মাটি, সবুজ ঘাস, বনপ্রান্তর বর্ষার জসল শ্যামলিমার সঙ্গে বাংলার শ্যামলবরণ স্নিগ্ধ মেয়েকেও কবি ভালোবাসেন। ‘মহুয়া’ কাব্য গ্রন্থের ‘নাম্নী’ কবিতাগুচ্ছের মধ্যে ‘শ্যামলী’র দেখা পাই।

“জগৎ সামান্যতার, তারি ধূলি পরে
বনফুল ফোটে অগোচরে”

‘শেষ সপ্তক’ কাব্যের ৪৪ সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন—

“আমা শেষ বেলাকার ঘরখানি
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে
তার নাম দেব শ্যামলী”

ধূলার ধরণীর ‘শ্যামলী’ই তাঁর শেষ বেলাকার আশ্রয়। আয়ুর প্রদোষকালে আমাদের হৃদয়াকাশ স্মৃতির মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে যায়(তখন সেই মানস স্থবিরতা থেকে মুক্তি(মেলে নিসর্গের উদার আশ্রয়ে(প্রকৃতির মাঝখনে এই শ্যামলনীড় সেই নিসর্গ অনুধ্যান ও অবগাহনের পরম আশ্রয়। শ্যামলীর কবিতায় সেই নিসর্গ অবগাহন শেষ পর্য্যন্ত এক অধ্যাত্ম-উপলব্ধিতে পেয়েছে পরম মুক্তি(। কবি জীবনের সায়াহ্ন(বেলায় অধ্যাত্মভাবনার পথে অনুকূল এই অনাড়ম্বর মাটির বাসা(তার নিরাসক্ত(উদাসী বিবাগী হৃদয় এই গদ্যকাব্যে ধরা পড়েছে।

এ কাব্যের অনেক কবিতায় মানবসত্তার অনন্য উপলব্ধি গভীর সুরে মন্দ্রিত। ‘আমি’ ‘চিরযাত্রী’ ‘প্রাণের রস’ কবিতায় সেই অনুভব দ্যোতনা আছে।

কবির শেষ বেলাকার কাব্যের বিশিষ্ট ধারা— প্রেমভাবনা। এ কাব্যেও অনন্য কয়েকটি প্রেমকবিতার দেখা পাই যাদের মধ্যে আছে দ্বৈত, বাঁশিওয়ালা, হারানো মন।

গদ্য কবিতার মধ্যে আখ্যায়িকামূলক কবিতা ‘পুনশ্চ’ থেকেই রচিত হয়ে আসছে। স্মৃতিমেদুর কয়েকটি অসামান্য কাহিনীধর্মী কবিতা ‘শ্যামলী’ কাব্যের বিশিষ্ট সম্পদ—এদের মধ্যে আছে ‘হঠাৎ দেখা’, ‘কবি’, ‘দুর্বোধ’, ‘অমৃত’। প্রেম কবিতা ও কাহিনী কবিতার মধ্যে অনেক সময়ই লেগেছে প্রথম যৌবনের প্রেমস্মৃতির বর্ণিমা।

জীবনের অপরাহ্নে(কবি তাঁর মাটির বাসায় বসে বি(্বপ্রাণের স্পর্শরস ভরে নিচ্ছেন আপন চেতনায়, নিসর্গ ভাবনা কখন যেন মিশে যাচ্ছে অধ্যাত্মভাবনায়—সেই সঙ্গে ‘তাপহারা স্মৃতি-বিস্মৃতির ধূপছায়া’ ঘেরা মধুর প্রেমকেও নূতনভাবে উপলব্ধি করছেন। প্রাণেতে প্রেমেতে বি(্বলীলার বাসা— শ্যামলী। একাব্যে আছে সেই অনুভবের শ্যামলিমা।

3.2.2 ঃ দ্বৈত

‘শ্যামলী’ কাব্যের প্রেম কবিতা, রবীন্দ্রনাথের ভাবধর্মী, রোম্যান্টিক মনোলোকের সৃষ্টি। প্রেমের চিরন্তন রহস্য নানাভাবে কবি কল্পনায় প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম যৌবনের আবেগ উচ্ছলতা না থাকলেও মনন সমৃদ্ধ কল্পনার ঐ(্বর্যে কবিতাগুলি উজ্জ্বল। জীবনসায়াহ্নে(অভিজ্ঞতালব্ধ কবি প্রেমের রহস্য ও জীবনদর্শন যেন দিব্যদৃষ্টিতে উপলব্ধি করেছেন।

‘শ্যামলী’ কাব্যের প্রথম কবিতা-দ্বৈত। এর নামের মধ্যেই যুগল জীবনের লীলার আভাস। এ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন প্রেমিকের আপন মনের মাধুরী মিশিয়েই সৃষ্টি হয় প্রেমিকা। প্রেমের দৃষ্টিতে যে সৃজনীশক্তি(তা-ই প্রেমিকাকে নতুনভাবে সৃষ্টি করে।

এই ভাবনাকে কবি প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে জানিয়েছেন। নিসর্গর রূপ মাধুরী বি(্বলোক থেকে মর্ত্যলোকে যখন মুক্তি(পায় তখনই তার চরিতার্থতা। ঊষার সোনার বিন্দু যখন ধরাতলে অ(ণরাঙা আভাসে আলো

আনে তখন পৃথিবীর শ্যামলিমায়তার সৌন্দর্য ছড়িয়ে পড়ে। অসীম যখন সীমার বাঁধনে ধরা পড়ে, তখনই তার পূর্ণতা। নারীর সুতনু সৌন্দর্য ও ললিত মাধুরীও তেমনি পূর্ণতা পায় প্রেমিক চিত্তের অনুধ্যানে। প্রেমের মধ্যে আছে সৃষ্টিশীল সত্তা যা তার মানসীকে তোলে নবসাজে। তাই প্রেমিক সত্তার স্বগত উচ্চারণ—

"দিনে দিনে তোমাকে রাঙিয়েছি

আমার ভাবের রঙে।"

বিশ্বলীলার মোহনরূপ যখন মর্ত্যলীলায় বাঁধা পড়ে, তখনি তার প্রকৃত রূপের উদ্ভাসন। বিধাতার লীলা মানবমনে তেমনি নতুনরূপে প্রতিভাত হয়। প্রেমই সাধারণকে অসাধারণ, তুচ্ছকে মূল্যবান করে তোলে। রোম্যান্টিক লীলাবাদের মূল কথাই তাই। মানবী মূর্তি প্রেমের পরশেই 'মানসী'তে রূপান্তরিত হয়।

"আমার প্রাণের হাওয়া

বইয়ে দিয়েছি তোমার চারিদিকে

কখনো ঝড়ের বেগে

কখনো মৃদুমৃদু দোলনে"

দ্বৈত ভাবনার এই লীলাই বলাকার ২৯ সংখ্যক কবিতায় প্রকাশ পেয়েছিল। সেখানে ভগবানের সঙ্গে মানুষের লীলা আধ্যাত্মভাবনায় আপনাকে প্রকাশ করেছিল। কবি বলেছেন ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করবার আগে তাঁর নিজের স্বরূপই উপলব্ধি করতে পারেননি।

"যেদিন তুমি আপনি ছিলেন একা

আপনাকে তো হয়নি তোমার দেখা।

★★ ★★ ★★ ★★

আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম

শূন্যে শূন্যে ফুটলো আলোর আনন্দ কুসুম

★★ ★★ ★★ ★★

আমি এলেম তাই তো তুমি এলে

আমার মুখে চেয়ে

আমার পরশ পেয়ে

আপন পরশ পেলে।"

—এই অনুভবের আলোতে দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈতের লীলা সার্থক(সীমার মধ্যে অসীমের উপলব্ধি। লীলাতত্ত্বের এই প্রকাশ 'বলাকা'য় দেখেছি।

'শ্যামলী' কাব্যের 'দ্বৈত' কবিতায় এই ভাবনাকে প্রেমিক-প্রেমিকার লীলারহস্যে আভাসিত করেছেন কবি। প্রেমিক চিত্তের অনুভবেই প্রেমিকার সর্বোত্তম প্রকাশ। এই অনুভবই গানের বাণীতে মুক্তি(পেয়েছে—

''আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে

তোমারে করেছি রচনা

তুমি আমারি তুমি আমারি''

বিধাতার সৃষ্টি যে নারী, প্রেমিকাচিত্ত তাকে নবরূপে সৃজন করে। যে ছিল একলা বিধাতার, প্রেমিক তাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে দেয় পূর্ণতা। দুজনের আনন্দ, দুজনের বেদনা মিলেমিসে এক হয়ে যায়।

''দেখিতে দেখিতে নূতন আলোকে

কে দিল রচিয়া ধ্যানের পুলকে

নূতন ভুবন নূতন দ্যুলোক

মোদের মিলিত নয়নে''

এই দ্বৈত জীবনের মাধুরীই কবিতাটিতে বর্ণিত। প্রেমের মধ্যে আছে সোনার কাঠির যাদুস্পর্শে যা সাধারণকে করে তোলে অসাধারণ।

3.2.3 ঃ আমি

'আমি' কবিতায় যে 'অস্মিতাবোধের' প্রকাশ তা কবির ব্যক্তি(গত অনুভূতির ঐ(র্যকে প্রকাশ পেয়েছে। কবি বি(াস করেন ব্যক্তি(সত্তার মধ্যেই ঘটে অসীমের প্রতিফলন।

'মানুষের অহংকার—পটেই

বি(কর্মার বি(শিল্প'

বি(সৃষ্টির মধ্যে সৌন্দর্য বিকশিত, তার চরম প্রকাশ ও উপলব্ধি মানবসত্তার মধ্যেই। নিত্যসত্তা যে 'আমি' তা আসলে অখন্ড অসীমের অংশ। সেই অখণ্ড অনন্য অসীম খণ্ড জীবনের উপলব্ধিতেই বি(-সৃষ্টিকে দেখতে পায়। মানুষ না থাকলে অসীমের প্রকাশ এমন সার্থক হতো না। তাঁর গানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

''আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা

আমার হিয়ায় চলেছে রসের খেলা

মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।''

'আমি' অর্থাৎ মানব সত্তার মধ্যেই বিশ্বস্রষ্টা নিজেকে খুঁজে পান।

''আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর

তোমার প্রেম হতো যে মিছে''

মানবসত্তার এই পরম উপলব্ধিই 'আমি' কবিতায় প্রকাশিত। রবীন্দ্রমননে সীমা-অসীমের যে স্বাজাত্য বোধের উপনিষদিক প্রত্যয় তা বারবার তাঁর কাব্যে সাহিত্যে ধরা পড়েছে।

'আমি' কবিতায় সীমার মধ্যে সেই অসীমের রম্যবাণীর প্রকাশ। মানবমনের উপলব্ধিতেই বিশ্বসৌন্দর্যের সার্থকতা। আমার চেতনার রঙে যখন পাথর হয়ে ওঠে মরকতমণি, ফুল হয়ে ওঠে সুন্দরের প্রতীক—তখনই সৃজনলীলার চরম ও পরম সার্থকতা। এ নয় কোনো তত্ত্বকথা, এ জীবনের সত্য। কবি বলেছেন—

'' এ সত্য

তাই এ কাব্য।

এ আমার অহংকার

অহংকার সমস্ত মানুষের হ'য়ে।''

'একাকী গায়কের নহে তো গান'— শিল্পী শ্রোতার যুগল মিলনেই তো গানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। বিশ্বস্রষ্টা তাঁর সৃজনসম্পদকে তখনই সার্থক বলে অনুভব করবেন, যখন মানবসত্তার মধ্যে তা প্রতিবিম্বিত হবে। কবিত্ব তখনই সার্থক যখন তা শ্রোতা-পাঠকের কানে প্রতিধ্বনিত হবে। বিধাতা যদি তাঁর সৃষ্টিকে মর্ত্য মানবের ব্যক্তিত্বে প্রতিবিম্বিত না দেখতে পান তাহলে ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্ব নিয়ে তিনি একা হয়ে যাবেন।

রবীন্দ্র ভাবনায় সীমা-অসীম এভাবেই নিজেকে প্রকাশ করেছে।

''অসীম যিনি, তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা

মানুষের সীমানায়,

তাকেই বলেই 'আমি'।।''

মানবসত্তা এবং জীবনবোধ, ব্যক্তিত্ব ও অসীম সত্তা, সৃষ্টি ও মৃত্যু রহস্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুগভীর চিন্তা ও জিজ্ঞাসা এই কবিতায় রূপ নিয়েছে বিশ্বপ্রসারী কবিকল্পনা সীমা ও অসীমকে মিশিয়েছে একটি বিন্দুতে।

ভারতীয় অধ্যাত্মবাদে যে 'সোহং' মনত্র তা' যেন কবির (্-পে লাভ করেছে বাণীরূপ। গভীর মননসম্পদে যে অধ্যাত্মবোধ ও জীবনদৃষ্টি কবি জীবনের শেষ পর্যায়ের কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে তারই নিদর্শন এই কবিতা। সৃষ্টির মূলে আছে আনন্দ সেই আনন্দধারা থেকেই সৌন্দর্য লীলার প্রকাশ, আবার প্রেমের আলোতেই সেই আনন্দ ও সৌন্দর্য পরমতম সম্পদ হয়ে ওঠে। সৃষ্টির প্রথম ও শেষ রহস্য আলো ও ভালোবাসার চরম প্রকাশ ও চরিতার্থতা মানবসত্তার মিলনে। তাই সৃষ্টি অর্থহীন হয়ে যাবে রসপিপাসু, আনন্দ অন্বেষী, প্রেম প্রার্থী মানবসত্তার অনস্তিত্বে। স্রষ্টা আপন অস্তিত্বকে উপলব্ধি করবেন মানবসত্তার 'আমিত্বে'। বিশ্বেবীণারবে বিশ্বেজন মুগ্ধ ভালোবাসার মন্ত্রে, সুন্দরের অর্ভ্যথনায়। মানবসত্তার 'আমিত্বে'র মধ্যেই আছে তার যথার্থ প্রকাশ 'বিশ্বেআমি'র রচনার আসরে। ব্যক্তি(-আমি'ই যথার্থ শিল্পী। বিশ্বেস্রষ্টার সৃজন সম্পদ যখন আমি 'আমি'-র উপলব্ধিতে উদ্ভাসিত তখনই তার পরিপূর্ণতা।

''সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর''

3.2.4 ঃ হঠাৎ দেখা

'শ্যামলী' কাব্যের প্রেমকবিতাগুলি আছে স্নিগ্ধ আন্তরিক ভঙ্গীর সহজ প্রকাশ। আধুনিক যুগের নতুন হাওয়ায় প্রেমেকে কবি উপলব্ধি করেছেন রোম্যান্স ও বাস্তবের যুগ্ম দৃষ্টিতে। গদ্য ছন্দে রচিত এর গল্পিকাগুলিতে প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে। এতে যেমন রোম্যান্টিক স্মৃতি মেদুরতা আছে, তেমনি আছে মোহমুগ্ধতার অতীত এক মুক্ত(দৃষ্টিভঙ্গী।

'হঠাৎ দেখা' 'কবি' 'অমৃত' তিনটি অসামান্য কবিতা— যার মধ্যে প্রেমের সহজ আলো বিকীর্ণ অথচ কোনো তত্ত্ব বা দার্শনিকতার প্রলেপ নেই। প্রণয়মূলক ঘটনা বৈচিত্র্যে এই কবিতাত্রয়ীর উৎস। এ প্রসঙ্গে 'পুনশ্চ'র গল্পিকাগুলির কথা মনে আসে, কিন্তু তাদের সঙ্গে 'শ্যামলী'র কবিতাগুলির মৌল পার্থক্য আছে। 'পুনশ্চ'র 'সাধারণ মেয়ে' বা 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি' শেষ হয়েছে নৈরাশ্য ও বিষাদে। কিন্তু হঠাৎ দেখা, কবি বা অমৃত কবিত্রয়ীতে নায়ক-নায়িকার মিলন না ঘটলেও বিচ্ছেদের বর্ণহীনতা বা রিক্ত(হতাশা নেই— বেদন মাধুরীতেই এগুলি অন্যতর মাত্রা পেয়েছে, পেয়েছে অনুভব গভীরতা। প্রেমের অমলিন মহিমা হঠাৎ দেখা' কবিতাকে ঘিরে আছে। যা হারিয়ে যায়, তা কি কোথাও থেকে যায় বুকের মধ্যে স্বপ্নের মধ্যে, আশার মধ্যে, ইচ্ছের মধ্যে, গোপন গানের মধ্যে? হারিয়ে গিয়েও যা হারায় না, শুধু সময়ের পলিমাটি ভেদ করে জেগে ওঠে স্মৃতির চর-প্রেমের নেই চিরস্মৃত মাধুরীই এ কবিতায় প্রকাশিত। চিরজীবী প্রেমানুভব নানাভাবে, রবীন্দ্রকাব্যে ফিরে ফিরে এসেছে।

আলোচ্য কবিতায় চলমান রেলগাড়ীর কামরায় হঠাৎ দেখা নায়ক-নায়িকার(অদূরে অতীতের টুকরো টুকরো স্মৃতির মালায় তাদের হারিয়ে যাওয়া দিন অনুভবের আয়নায় ধরা পড়ে। কবি এদের নির্দিষ্ট নামকরণে সুচিহ্(ত করেন নি, তাই বিশেষ হয়েও এরা বিস্তৃতি লাভ করেছে নির্বিশেষের মধ্যে।

'পুনশ্চ'র 'ক্যামেলিয়া' কবিতায় দেখেছিলাম কমলা চিনতে চাইছে না বলে নায়কের উপলব্ধি—

"আমাকে সে যে চিনেছে

বুঝলেম

আমাকে ল(্য করে না বলেই"

'হঠাৎ দেখা'য় "সে রইল জানালায় বাইরের দিকে চেয়ে

যেন কাজের দিনের ছোঁয়াচ-পার-হওয়া চাহনিতে"

'পুনশ্চ'র পরবর্তী কাব্যধারায় রোম্যান্টিক কবি ভাবনার সঙ্গে মিলেছে রিয়ালিস্টিক সমাজভাবনা। তাই অনাদি কালের হৃদয় উৎস থেকে উৎসারিত দুটি হৃদয়ের সার্থক প্রেম এখানে বাস্তব পরিণতি পায়না। আধুনিক যুগের নির্মমতা প্রেমকে করে বিচ্ছিন্ন। তাই পরস্পরকে ভালোবাসার উত্তাপটুকু হৃদয়ে মেখে বিরহের বেদনায় তারা বিদ্ধ হয়। আবার প্রাত্যহিকতার দায় মেটাতে, জীবনের হিসেব মেলাতে মেলাতে প্রেম হয়ে যায় দূরস্মৃত কোনো অনুভব মাত্র।

তারপর হঠাৎ একদিন তাদের দেখা হয়ে যায় রেলগাড়ীর কামরায়। কবিতায় 'রেলগাড়ী' যেন কালের চলমানতার প্রতীক, অতীত থেকে বর্তমানের মধ্য দিয়ে ভাবীকালের দিকে তার যাত্রা।

'রেলগাড়ীর কামরায় হঠাৎ দেখা

ভাবিনি সম্ভব হবে কোনোদিন'

অথচ সম্ভাবনার স্বপ্ন কোথায় যেন সুপ্ত ছিল(গতিশীল আধুনিক জীবন যেন রেলগাড়ীর ভ্রমণের মত নিরবচ্ছিন্ন এগিয়ে চলেছে। আমরা সবাই দাঁড়িয়ে আছি রেলস্টেশনে, অপে(া করে আছি গন্তব্যে পৌঁছবো বলে। যাত্রীরা উঠছে, নামছে এমনই প্রাত্যহিকতার মধ্যে হঠাৎ নায়ক-কথক দেখা পেয়ে যায় তার হারানো দিনের মানসীর। বুকের কোন্ গোপন তারে যেন কাঁপন লাগে। 'হঠাৎ দেখা' যেন বহুমূল্য রত্নের মত এক আশ্চর্য সম্পদ, সে অসম্ভব ছিল বলেই অসম্ভব তার মূল্য।

দীর্ঘদিনের অদর্শনের পর এই হঠাৎ দেখা যেন নায়ককে নিয়ে যায় স্মৃতিচারণার মহাঙ্গনে। তাই মনে মনে অতীত কালের ছবি আঁকে নায়ক-ব্যর্থ বসন্ত যেন রক্তি(ম অনুভবে মঞ্জরিত হয়ে ফিরে আসে তার জীবনে। তার মনে পড়ে আগে ওকে বারবার দেখা গেছে লালরঙে শাড়িতে-দালিম ফুলের মতো রাঙা সেই রঙ লেগেছিল দুটি মুগ্ধ হৃদয়েও। অতীতের দিন আজ ধূসরিমায় আঁকা—তাই কালো রেশমের শাড়ীতে আঁচল তোলা মাথায় একটা

গভীর দূরত্ব ঘনিয়ে আছে চারপাশে। রক্তরাঙা শাড়ির বদলে কালো রঙের প্রয়োগ কবি করেছেন সচেতন ভাবেই। প্রেমের রক্তিমে স্পর্শ যেন বিরহ বেদনার কালিমায় ঢাকা পড়েছে।

''থমকে গেল আমার সমস্ত মনটা

চেনা লোককে দেখলেন অচেনার গাম্ভীর্যে''

—এই অচেনার আভাস-ই প্রেমিক যুগলের মাঝে এনেছে অপরিচয়ের আড়াল ও দূরত্ব। কিন্তু এই ব্যবধান ও দূরত্ব আসলে সত্য নয়, কেবল দৃষ্টির অস্বচ্ছ সীমাবদ্ধতা। সাঁঝের আকাশেও সন্ধ্যাতারা যে আসলে ভোর আকাশের শুকতারা সেই অনুভবেই প্রেমমধুরিমার প্রকাশ ঘটেছে এ কবিতায়।

তাই স্বল্পায়তন গদ্য কবিতাটির দ্বিতীয় পর্বে নায়ক নায়িকার মধ্যে কথোপকথনের শুরু। রোম্যান্টিক কবিতায় লেগেছে সমাজ বাস্তবতার ছোঁওয়া। তাই প্রচলিত পদ্ধতিতে আলাপচারিতা শুরু।

''সে রইল জানলার বাইরের দিকে চেয়ে যেন কাছের দিনের ছোঁয়াচ পার হওয়া চাহনিতে'' আপাত বিস্মৃত প্রেমের চিরস্মৃত অনুভব কবিতাটির অবয়বে ছড়ানো। তাই অনেক না বলা কথার আভাস জড়ানো রইলো অস্ফুট কিছু টুকরো সংলাপে। যে কথা দুজনেরই মনে তুলেছিলো স্মৃতি তরঙ্গের দোলা সেই কথাটিই অমোঘ প্রশ্ন হয়ে উঠে এলো নায়িকার উক্তিতে যে প্রশ্নটির জবাব এতকাল থেমে আছে সেটাই নায়কের মুখে শুনতে চেয়ে মেয়েটি শুধায়—

''আমাদের গেছে যে দিন

একেবারেই কি গেছে

কিছুই কি নেই বাকি?''

এর জবাবে নায়কের উত্তর—

''রাতের সব তারাই আছে

দিনের আলোর গভীরে।''

প্রেমের বিস্মৃত-চিরস্মৃত মহিমার অনন্য স্বীকারোক্তি। প্রেমের এই চিরজীবী শক্তিকেই এর আগে কবিপ্রকাশ করেছেন অন্যভাবে।

''ভুলে থাকা নয় তো ভোলা

বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা''

—রবীন্দ্রকাব্যে নানাভাবে বহুবার প্রেমের শক্তি ও গৌরব স্বীকৃতি হয়েছে। 'হঠাৎ দেখা' কবিতাতেও সেই স্বীকৃতির পরিচয়। আকস্মিকতার কিরণে দীপ্ত স্মৃতিমন্থিত কবিতাটি যেন এক দীর্ঘশ্বাস। এক নিরুচ্চার

বেদনা ও স্মৃতিমাধুরী কবিতাটিকে দিয়েছে অন্য মাত্রা। কিন্তু আধুনিক জীবনের সত্যরেখায়কবিতাটি উজ্জ্বল। তাই নায়কের স্বগতোক্তি(তার দ্বিধা ও আত্মজিজ্ঞাসাকেই তুলে ধরে ‘‘খটকা লাগলো, কী জানি বানিয়ে বললেম নাকি’’।

এই দ্বিধা আসলে অস্থির আধুনিক যুগযন্ত্রণার ফসল। স্মৃতি পিপীলিকা কি সত্যিই আজ আমার রন্ধ্রে মৃতমাধুরীর কণা সঞ্চিত করে নাকি চলমান জীবনধারায় স্মৃতিও আজ অচঞ্চল নয়—এই স্বগত প্র(ের দোলাচলতায় দ্বিধাজর্জর নায়কচিত্ত।

এই অস্থির চঞ্চল বর্তমান জীবন কি অতীত স্মৃতিকে চিরজীবী করে রাখতে পারে—এ প্র(আধুনিক কালের অনন্ত জিজ্ঞাসা, অনুত্তর থেকে যায়।

তাই কবিতার শেষ চরণ—

‘‘সবাই নেমে গেল পরের স্টেশনে

আমি চললেম একা।’’

অতীত প্রেমের স্মৃতিমাধুরী নিয়ে এভাবেই প্রাত্যহিক দিন যাপনের পথে একাকী এগিয়ে চলে নিঃসঙ্গ মানবসত্তা। যে দুঃখকে ভুলে থাকার মত দুঃখ আর নেই প্রেমের সেই চিরস্মৃতি বেদনমাধুরীর গৌরবেই কবিতাটি শেষ হয়েছে। সেখানে সবাই নেমে গেলেও নায়ক অবিরাম এগিয়ে চলে—আধুনিক যুগ জীবনের একক নিঃসঙ্গ প্রেমিক সত্তা। ‘অভাবনীয়র কচিৎ কিরণে দীপ্ত’ এই ‘হঠাৎ দেখা’য় তাই বাস্তব দৃষ্টি ও রোম্যান্টিক প্রেমানুভব একই সঙ্গে মিলে গেছে।

3.2.5 ঃ বাঁশিওয়ালা

‘শ্যামলী’ কাব্যের বিশিষ্ট কবিতা ‘বাঁশিওয়ালা’ রবীন্দ্রপ্রেম কবিতায় ধারায় এক অনন্য সংযোজন। গল্প রসাশ্রয়ী এই কাহিনী কবিতার বি(-ষণ করলে রবীন্দ্রমনোলোকের রোম্যান্টিক প্রেমভাবনায় পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার বৈশিষ্ট্য দেহাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত অনুভব। দেহাশ্রিত প্রেম (ণস্থায়ী মরণশীল, কিন্তু দেহাতীত প্রেম অ(য়, মরণজয়ী, মর্ত্যের মানুষকে মহিমান্বিত করে প্রেম—এই ভাবনাই তাঁর প্রৌঢ় বয়সে লেখা ‘শ্যামলী’ কাব্যেও অনুসৃত হয়েছে। ‘বাঁশিওয়ালা’ কবিতায় প্রেমের মর্ত্যলোক থেকে অমর্তলোকে যাত্রার কথা বলা হয়েছে।

কবিতাটিকে বলা যায় রূপক। নারীর মধ্যে যদি প্রেমের সঞ্চার ঘটে, যদি সে তার অন্তরের প্রেমকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তাহলে সেই প্রেমের গৌরবে সে অন্তরে অমৃতময়ী হয়ে ওঠে।

সত্যিকারের প্রেম নারীকে করে তোলে কল্যাণী, করে তোলে শক্তিময়ী, করে তোলে বিদ্রোহিনী। এই অনুভবের কথাই রূপকের আড়ালে বাঁশিওয়ালা' কবিতায় আভাসিত। বাঁশিওয়ালার বাঁশির সুরে বাংলাদেশের সাধারণ মেয়ে নিজের মধ্যে যেন নতুনকে আবিষ্কার করতে চায়, পাঠকের মনে পড়তে পারে 'সাধারণ মেয়ে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ 'মালতী' নামের একটি মেয়ের কথা লিখেছিলেন; তাকেই যেন এই কবিতায় আবার খুঁজে পাওয়া গেল। কবির মনে হয়েছে সৃষ্টিকর্তা বিধাতা বাংলাদেশের মেয়েকে পুরোপুরি গড়ে তোলেননি, রেখেছেন আধাআধি করে। গতানুগতিক জীবন কাটাতে কাটাতে তার দিন যায়। নিজের জীবনের ক্লান্তিতে যখন সে বিবর্ণ, তখনই যেন বাঁশিওয়ালার বাঁশির সুর বেজে ওঠে। এই বাঁশি প্রেমের মোহনিয়া ডাক যা একসময়ে প্রতিটি মেয়ের জীবনে রোম্যান্টিক স্বপ্নাভিসারের আমন্ত্রণ বয়ে আনে। তার মরা নদীর মতো জীবনে ভরা জোয়ারের দুকূল ছাপানো প্লাবন তখনই আসে। এই ডাক আসলে নবযৌবনের আবাহনের ডাক। সাধারণ মেয়েও তখন নিজের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করে ছুটে যেতে চায়। বাঁশিওয়ালার ডাকে যেন তার নতুন জন্ম হয়। তার অতিসাধারণ জীবনের গতানুগতিক প্রহরে বাঁশি শুনে জেগে ওঠে বিদ্রোহিনী নারী সত্তা। এতদিন যে ছিল ঘরপোষা নির্জীব মেয়ে, যে কেবল লুকিয়ে কাঁদতে জানতো, নিজের মধ্যে আগুনের স্পর্শ পেয়ে জেগে উঠলো নতুন করে। রবীন্দ্রনাথ অতিসাধারণ নারীর জীবনেও প্রেমের স্পর্শে অসামান্য জাগরণের কথা বলেছেন এই কবিতায়, প্রেমের অসামান্য শক্তি সাধারণকেও করে তোলে অসাধারণ। তখন বিবর্ণ বর্তমান থেকে বর্ণময় ভবিষ্যতের স্বপ্নসম্ভাবনায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নারীর অন্তরতর সত্তা। বাঁশিওয়ালা সেই অন্তর্লোকের চিরকালীন প্রেমের আহ্বান, যা মর্ত্যজীবনে আনে অমর্ত্য মাধুরীর অনির্বচনীয় অনুভব।

কবিতাটির সঙ্গে 'পুনশ্চ'র সাধারণ মেয়ে কবিতার কোথায় যেন আছে অন্তর্লীন সাদৃশ্য। সেখানে লেখক শরৎবাবুকে অন্তঃপুরের এক সাধারণ মেয়ে লিখেছিল খোলা চিঠি—তার একান্ত অনুরোধ ছিল দরদী লেখকের কাছে—তিনি যেন তাকে নিয়ে একটি গল্প লেখেন।

এখানে বাংলার শ্যামল মাটির শ্যামলী কন্যা বাঁশিওয়ালাকে লিখেছে চিঠি—তার বাঁশির সুরে সে শুনতে চায় তার নতুন নাম। দুটিতেই প্রেমের বেদনা, আনন্দ ও প্রত্যয় ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু প্রকাশ ভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বরূপে দুটি ভিন্ন রূপ নিয়েছে।

সাধারণ মেয়ে মালতী তার মিলিয়ে যাওয়া প্রেম ও প্রত্যাখ্যানের বঞ্চনাকে জয় করার অসম্ভব স্বপ্নকে সার্থক করতে চেয়েছে। দরদী লেখকের কাছে তার অনুরোধ সীমাবন্ধতার সীমানা ছাড়িয়ে তিনি যেন তাকে মুক্তি দেন স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। সে জানে তার স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে। কৃপণ বিধাতার করুণা বর্ষিত হবে না সাধারণ মেয়ের জীবনে।

কিন্তু বাঁশিওয়ালার অনামিকা মেয়েটি প্রেমের বীর্যে অশঙ্কিনী হতে চেয়েছে। অতি সামান্য মেয়েটি প্রেমের জোয়ারে যেন জেগে ওঠে; তার মরাজীবনের ভাঁটার টানে লাগে জোয়ারের কাঁপন—সেই প্রেমের জোয়ার যখন আসে তখন অতি সাধারণ মেয়েও হয়ে ওঠে আত্মশক্তিতে উদ্দীপিত। সেই সাধারণ মেয়ে আর এই

শ্যামলী কন্যা এক জায়গায় মিশে যায়। সাধারণ মেয়ে 'ফরাসি জার্মান না কাঁদতে শুধু জানে।'

শ্যামলীর মেয়েটিও একই উচ্চারণে বলে

'কঠিন করে জানিনে ভালোবাসতে
কাঁদতে শুধু জানি
জানি এলিয়ে পড়তে পায়ে।'

'সাধারণ মেয়ে' প্রেমের বঞ্চনা আর প্রত্যাখ্যানের আঘাতে জেগে উঠেছিল(অসম্ভব স্বপ্ন পূরণের দুর্মর বাসনায় সে চেয়েছিল প্রাণশক্তি(তে জেগে উঠতে(

'বাঁশিওয়ালা'র অনাম্নী অঙ্গনা জেগে ওঠে প্রেমের অভিষেকে। যৌবন নিকুঞ্জে যখন প্রেমের পাখী জাগরণের গান শোনায়—তখন সব দ্বিধা সঙ্কোচ ঘুচিয়ে 'ঘরপোষা নির্জীব মেয়ে' জেগে ওঠে, তার বিদ্রোহিনী সত্তা তাকে বাঁধন ছেঁড়ার সাধন পথে ডাক পাঠায়। সব মেয়েই কোনো না কোনো পরম লগ্নে জেগে ওঠে আত্মপ্রত্যয় দীপ্ত প্রেমের মন্ত্রে, তার সুপ্তির ঘোর ভেঙে যায় বাঁশিওয়ালার বাঁশির সুরে।

3.2.6 ঃ চিরযাত্রী

কবিতাটির নামকরণেই আছে গতিময়তার আভাস। বারবার জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানবসত্তার চিরপথিক রূপ এ কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে।

'বলাকা' কাব্যে যে গতিবাদের তত্ত্ব প্রকাশিত, রবীন্দ্রমনে তার একটি সুদূর প্রসারী প্রভাব রয়ে গেছে। প্রকৃতির মধ্যে, বি(শ্বছন্দে এক অশান্ত গতিবেগ বর্তমান। কবি মনে করেন এই চলমান গতিপ্রবাহের মধ্যে মানবজীবনেরও চরম সত্যরূপ নিহিত। পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গতিময় বিবর্তনই মানবজীবনের সত্য। জড়ত্বের বন্ধন ঘুচিয়ে মৃত্যুভয় বিপদবাধা তুচ্ছ করে নবজীবনের চিরযাত্রা অবিরাম চলেছে। 'ফাল্গুনী' নাটকে এই চিরযাত্রার, নবায়মানতার, কথাই ধ্বনিত।

'শ্যামলী' কাব্যের 'চিরযাত্রী' কবিতায় এর চিরপথিক সত্তার কথা প্রকাশিত। 'বলাকা' কাব্যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে অবিরাম চলার সুর—''হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনোখানে''

''চিরযাত্রী' কবিতায় দেখি—

''আকাশে বেজে উঠছে নিত্যকালের দুন্দুভি
—পেরিয়ে চলো
পেরিয়ে চলো।''

মানবসভ্যতার ইতিহাস এই গতিময়তার ইতিহাস। সৃষ্টির আদিকাল থেকে এই চিরযাত্রা শুরু। প্রাক-

পুরাণিক কালের সিংহদ্বার দিয়ে সন্ধানী পর্যটক, সাধকের দল বেরিয়ে পড়েছে— নব আবিষ্কারের আনন্দ ও আশা তাদের অভিযাত্রাকে করেছে অব্যাহত।

অতীতকাল থেকে অনাগত কালের উদ্দেশ্যে চিরযাত্রী মানবের এই অনন্ত পথচলা অব্যাহত। যুদ্ধভেরী যেমন সৈনিকদের রাখে অতন্দ্র, তাদের ডাক পাঠায় সংগ্রামের উত্তেজনায়, তেমনভাবেই মানবসভ্যতার ইতিহাসে অবিশ্রান্ত বেজে চলেছে নিত্যকালের দুন্দুভি। আরামের গৃহকোণ, নিরাপদ সুখশয্যা ছেড়ে অভিযাত্রীদল চলেছে সুদুর্গমের পথে। অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার ল(্যে দুর্গমের হাতছানিতে পথে নেমেছে মানুষ যুগে যুগে। অনাদিকাল থেকে অনাগত কালের দিকে তাদের অনন্ত যাত্রা।

—'কোনো আদিকালে মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে

বি(েপথের চৌমাথায়।

পাথেয় ছিল রক্তে(, পাথেয় ছিল স্বপ্নে

পাথের ছিল পথেই।''

—এই চলমানতাই জীবনের সুর। মানবসত্তার মধ্যেই আছে এই অভিযাত্রার অভীমন্ত্র। তাই তার যাত্রার শেষ নেই। নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয়েও তার শান্তি নেই, সমস্ত জীবনই এক অনিশ্চিত রণাঙ্গন—

''যুদ্ধ হয়নি শেষ

বাজছে নিত্যকালের দুন্দুভি''

তাই রক্তে(লেগেছে মাতন, নতুন উদ্যমে আবার পথে নামার পালা।

কবির মনে হয়েছে মানবসভ্যতার আদিকাল থেকে যে পথ পরিত্র(মা শুরু হয়েছিল, তার শেষ হয়নি, তার কোনো শেষ নেই। প্রতি মুহূর্তেই সজাগ থাকতে হবে, কবে আসবে আদেশ— ''বন্দরের কাল হল শেষ''—এবার যাত্রীদলকে যেতে হবে।

যুদ্ধ জয় আসলে নতুন করে যুদ্ধ যাত্রার প্রস্তুতিকেই নির্দেশ করে। কালের রথচলা রাস্তায় জয়ের নিশানা তুললেও তা বারবার চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ে, আবার জয়যাত্রায় নতুন অভিধানে যাবার জন্য চিরপথিক যাত্রীকে প্রস্তুত হয়।

মানুষের সমস্ত জীবন এই পথ চলার ইতিহাস। জীবনপ্রবাহ এই চলমানতার ছন্দে গ্রথিত। থেমে থাকাই মৃত্যু। গতিই প্রাণের মন্ত্র। তাই মানুষের চিরযাত্রা অব্যাহত কারণ কালপ্রবাহ অনন্ত বহমান। সভ্যতার উষালগ্ন থেকে পথিক দলের অভিযাত্রা তাই শা(েত—আকাশে বেজে চলেছে নিত্যকালের ভেরী—যাত্রী দলের সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে চলেছে অবিরাম জীবনযাত্রা পথে।

3.2.7 ঃ অনুশীলনী

১। রবীন্দ্রকাব্য ধারায় শ্যামলীর স্থান নিরূপণ করুন।

২। 'দ্বৈত' কবিতার মমার্থ প্রকাশ ক(েন।

৩। ''গদ্য কবিতার সার্থক প্রকাশ 'হঠাৎ দেখা' প্রেমের স্মৃতি-মেদুর ভাষ্য—আলোচনা ক(েন।

৪। 'বাঁশিওয়ালা' কবিতার নামকরণ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে কবিতার মর্মার্থ বি(ে-ষণ ক(েন।

৫। 'আমি' কবিতার স্বরূপ বি(ে-ষণ ক(েন।

৬। 'চিরযাত্রী' কবিতায় প্রকাশিত রবীন্দ্রভাবনার পরিচয় দিন।

3.2.8 ঃ গ্রন্থপঞ্জি

১। রবীন্দ্রকাব্য পরিত্র(মা—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

২। রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়—(ু দিরাম দাশ

৩। রবীন্দ্র সৃষ্টি সমী(া—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়